যুগান্তর

তারিখ ... 06 OCT 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

মাধ্যমিক স্তরে ৮৩ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে

মুসতাক আহমদ

মাধ্যমিক স্তরে ৮৩ ভাগ শিক্ষার্থীই ঝরে পড়ছে। তবে এর চেয়েও উদ্বেগজনক খবর হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর ৫৫ ভাগ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে পা-ই রাখে না। বিগত এক দশকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত চারটি 'ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প' বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থী উপস্থিতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও চূড়ান্ত বিবেচনায় তা তেমন সফলতা আনতে পারেনি। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের শতকরা মাত্র ১৪ জন আর ছাত্রদের মধ্যে ২০ জন অংশ নেয় এসএসসি পরীক্ষায়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, প্রাইভেট প্রথা, বাল্যবিয়ে, স্কুল ও আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশ, স্বল্পসংখ্যক উপবৃত্তিসহ পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে এর জন্য সমানভাবে দায়ী করেন সংশ্লিষ্টরা। সম্প্রতি এক বেসরকারি গবেষণায় মিলেছে এ তথ্য। তবে প্রকৃত অবস্থা আরও করুণ বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সমীক্ষা মতে, সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও মাদ্রাসায় বছরে ৮০ লাখের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। কিন্তু সর্বশেষ ২০০৭ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় ৯টি বোর্ডে ১০ লাখ ২৯ হাজার ৯৮৫ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। অন্যান্য বছরও পরীক্ষার্থী ছিল এ সংখ্যার কাছাকাছি। কানাডার সাইমন ফ্রাজার শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

শিক্ষার্থী : মাধ্যমিক

(৩য় পৃষ্ঠার পর) ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট মিস ভেনিশার হোড বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) ভিজিটিং ফেলো হিসেবে মিস হোডের করা ওই গবেষণায় ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জ জেলার চারটি স্কুলকে গবেষণার অধীনে আনা হয়। এতে ড্রপআউটের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প' নারী শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে কিনা সে প্রসঙ্গও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

মিস হোডের গবেষণা মতে, ২০০৬ সালে প্রাথমিক স্তর সফলভাবে সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪৫ ভাগ মাধ্যমিক স্তরে পা রাখে। ১৯৯৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির এ হার ছিল ৩৩ ভাগ। অর্থাৎ ২০০৬ সালে ৫৫ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর শেষ করার পরই বিদায় নেয়। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকস্বল্পতা, অপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম, অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও ইকুইপমেন্টের অভাব এর অন্যতম কারণ। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, এ সময়কালে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের ভর্তি আশাব্যঞ্জক বেড়েছে। এর জন্য ছাত্রী উপবৃত্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের ড্রপআউটের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য। এছাড়া অভিভাবকদের অশিক্ষা, প্রাথমিক স্তরের দুর্বল ভিত্তি নিয়ে মাধ্যমিকে ভর্তি, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় প্রাইভেট টিউটরিং চালাতে অক্ষমতা, বাল্যবিয়ে, স্বল্পসংখ্যক উপবৃত্তি, স্কুল ও পরিবারের পারিপার্শ্বিক অবস্থা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এ অবস্থায় সাধারণ ও উপবৃত্তিপ্রাপ্ত দু'শ্রেণীর ছাত্রীরাই ঝরে পড়ছে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ড্রপআউট হয় সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার সময়। ওই শ্রেণীতে ড্রপআউটের হার ৩২ ভাগ। এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৬, অষ্টম শ্রেণীতে ১৬, নবম শ্রেণীতে ১৬ এবং দশম শ্রেণীতে ২০ ভাগ ড্রপআউট করে। ড্রপআউটের শিকার ছাত্রীদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের। গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক কারণসহ বিভিন্ন কারণে এরাই স্কুলে বেশি অনুপস্থিত থাকে। এ অবস্থায় অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের পড়ালেখার ব্যাপারে উৎসাহবোধ করেন না। তখন ড্রপআউট অনিবার্য পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়।

ছাত্রদের ড্রপআউট করার পেছনে গবেষণায় পাঠ্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা ও দারিদ্র্য নিরসন এবং কর্মসুযোগ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় অবদানের অভাবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গবেষক মিস হোড বলেন, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মানের কোন উন্নতি হচ্ছে না। কারিকুলাম এবং ট্রেড ও ভোকেশনাল শিক্ষা এজন্য বিশেষভাবে দায়ী। বেশকিছু শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে ট্রেড ও ভোকেশনাল শিক্ষার দিকে চলে যায়। এছাড়া শিক্ষা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের সুযোগ-সুবিধার অতি কেন্দ্রীভূতকরণ, ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষিত ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং স্কুল ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতাও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তিনি ছাত্রীদের উপবৃত্তি লাভের জন্য পাস নম্বর ৪০ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সমন্বিত কর্মপ্রয়াস, স্কুলের একাডেমিক-আর্থিক কার্যাদি মনিটরিং ও মূল্যায়নের সুপারিশ করেন।